ডিকনস্ট্রাকশন বা নারী সম্পর্কে তিনটি বা দুটি কথা যা আমি জানি

অজিত চৌধুরী

॥ প্রথম ভাগ ॥

এক

এটি একটি ডিকনস্ট্রাকশন বিষয়ক প্রবন্ধ হবার কথা ছিল। পরিবর্তে আমি নারী বিষয়ে তিনটি বা দুটি কথা বলব। মৃত্যু বিষয়েও আমার কিছু বলার আছে। পাঠককে জানিয়ে রাখা ভাল যে এই প্রবন্ধে আমরা ডিকনস্ট্রাকশনের পিতা ডেরিডাকে খুন করব, যেহেতু ডেরিডা হলেন সবচেয়ে বড় মডার্নিস্ট (যা আমাদের শত্রু), একজন ঝকঝকে ফরাসী কান্ট। আমরা অবশ্য সকলকে জানতে দেব না যে ডেরিডাকে আমরা খুন করেছি। বলা হবে যে পুলিশের গুলিতে পোস্টমডার্ন ডেরিডা নিহত। কেননা ডেরিডার খ্যাতি এবং ইমেজের আমাদের প্রয়োজন আছে।

সদর দপ্তরে কামান দাগো : ডেরিডাকে ডিকনস্ট্রাকট কর।

দুই

কখনও, কোথাও, কোনো সাম্য ছিল না, নেই। একদল—উচ্চবর্গ—শাসন করে, আদেশ করে, বোঝায়, নির্দেশ দেয়; বাকিরা, যারা নিম্নবর্গ, মান্য করে, প্রভুর সহযোগিতা করে, প্রতিবাদ করে, প্রতিরোধ গড়ে : শাসিত হয়। এই উপলব্ধিই হল ডিকনস্ট্রাকশন বোঝার প্রাথমিক শর্ত।

শব্দের জগৎ কোনো ব্যতিক্রম নয়। একটি লেখায়, বাক্যে, অনুচ্ছেদে কয়েকটি উচ্চবর্গ শব্দ শাসন করে ; এই শাসক শব্দগুলির আলোকে (অন্ধকারে) আমরা অপর শব্দগুলি দেখি, জানি, বুঝি। শাসক শব্দগুলি শাসিত শব্দগুলির উপর খবরদারি করে, শাসিত শব্দগুলিকে তার বিপরীত—অপর রূপে—প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে শাসক ও শাসিত শব্দের সমঝোতা এবং তার (চাপা) বিরোধিতার টানাপোড়েনে একটি লেখা, অনুচ্ছেদ, বাক্যের অর্থ তৈরি হয়। পাঠকও এই শ্রেণীযুদ্ধের বাইরে নয়। সে কয়েকটি শব্দের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করে, বিশেষভাবে বোঝে যা তার অপরশব্দগুলি সম্পর্কে—অর্থাৎ সম্পূর্ণ লেখাটি বিষয়ে—ভাবনাকে প্রভাবিত করে। এইভাবেই একটি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের অর্থ তৈরি হয়।

ডিকনস্ট্রাকশন হল এক ইনভার্সান (টেবিল ওলটানো) যেখানে শাসক এবং শাসিত শব্দগুলি অর্থগত অবস্থান অদলবদল করে এবং ফলত বাকি আপাত নিরপেক্ষ শব্দেরা,

যাদের শাসক / শাসিত কাঠামোয় সরাসরি ফেলা যায় না, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়, ডিসপ্লেসড হয়। তখন আমরা পরিচিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধটিকে নতুন আলোকে দেখি, ভিন্নতর অর্থে বুঝি : ডিকনস্ট্রাকট করি। তত্ত্বগতভাবে এই প্রক্রিয়া শেষহীন। বাস্তবে নয় কেননা কেতাবি ডিকনস্ট্রাকশন দাবি করে যে এই প্রক্রিয়ায় লেখাটির অর্থের আমূল পরিবর্তন—ইনভার্সান—কিছুটা প্রান্তিক অদলবদল (সংস্কার, সংশোধন) নয়। এটা সবাই পারে না (ইমাজিনেশন দরকার হয়); সবসময় সম্ভব নয় (সময় আমাদের নতুনভাবে দেখতে / বুঝতে সাহায্য করে;) সব লেখাকেও (ভীষণ সাদামাটা মাথামোটা লেখা) সম্ভব নয়। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে আমাদের একটি পরশ-পাথর আছে যার স্পর্শে সব কিছুই সোনা হতে পারে, হয়। যাঁরা একটি অবহেলিত লেখায় বা পদহেলিত টীকায় হীরের খনি আবিষ্কার করেন, তাঁরা ডিকনস্ট্রাকশনের বড় কারিগর।

উদাহরণ : পিন ফুটল, (তাই)

ব্যথা লাগল।

এই বাক্যে পিন আগে ; ব্যথা পরে।

অতএব পিন কার্য ; ব্যথা কারণ।

আবার অন্যদিক থেকে দেখলে :

ব্যথা লাগল তাই বুঝলাম যে পিন ফুটেছে।

অতএব, ব্যথা আগে (কার্য) ; পিন পরে (কারণ)।

এইভাবে কার্য-কারণ সম্পর্কের এক ইনভার্সান ঘটানো হল ; পিন, যাকে আমরা প্রাথমিকভাবে কার্য হিসাবে বুঝেছিলাম, কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত হল। এই ইনভার্সান ডিকনস্ট্রাকশনের জন্য প্রয়োজনীয় একটি প্রথম ধাপ : কোনো বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি শব্দকে ভিন্নতর—বিপরীত—অর্থে বোঝ (ভাল=মন্দ, ঈশ্বর=দানব, কার্য=কারণ)। একটি প্রয়োজনীয় প্রথম ধাপ : অতএব আরও কিছু করার থাকে।

এই ইনভার্সান ভাবনার জগতে যে টেউগুলি আনে তাদের অনুসরণ কর। যেমন আমরা দেখলাম যে কার্যই কারণ হতে পারে যার অর্থ দাঁড়ায় : কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নাই। এইভাবে কার্য-কারণ সম্পর্কের যুক্তি অনুসরণ করেই দেখানো যায়—গেল—যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। দর্শনের জগতে একটি ধস নামল। এটি ছিল নিটশেসের উদাহরণ।

উদাহরণ বাড়াচ্ছি। মার্ক্সের ক্যাপিটাল : এই বইটির কি কোনো নির্দিষ্ট মানে আছে? না ; বইটি বিভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্ন অর্থ বহন করে। আমরা কখনই ফাঁকা মাথায়, খোলা মেজাজে একটি বই পড়ি না। মাথাটিতে সবসময়েই কিছু থাকে, ঘোরে : আমাদের পূর্বপাঠ, চারপাশে যা ঘটছে, আমাদের সময়। একজন ক্লাসিকাল পলিটিকাল ইকনমি (স্মিথ, রিকার্ডো) বিশেষজ্ঞ মার্ক্সের শ্রম-ধারণাটিকে একটি বিশেষ অর্থে বুঝলেন—যেমন তিনি বুঝেছিলেন তাঁর রিকার্ডো পাঠে : শ্রমসময় মানে

শ্রমসময় মানে শ্রম সময় যা হাতঘড়ি দিয়ে মাপ-জোক করা যায়। তাঁর এই ধারণার আলোকে কিছু বাকি শব্দের অর্থ তৈরি হল ; বাদবাকিরা একদম অন্ধকারেই রইল। এইভাবে ক্লাসিকাল পলিটিকাল ইকনমি এই কনটেক্সট কয়েকটি শব্দ (শ্রম) কে একটি বিশেষ জায়গা করে দিল যা বাকি শব্দগুলির এবং ফলত পুরো লেখাটির অর্থ নির্ধারণ করে। আর একজন, হেগেলবিশারদ, শ্রমকে একটু অন্যভাবে বুঝলেন : শ্রম এক বিমূর্ত ধারণা (তোমার শ্রম আমার শ্রম মূর্ত, কিন্তু শ্রম মানে কী ?) যা হাতঘড়ি দিয়ে মাপা যায় না। তখন অন্য শব্দগুলোর অর্থও বদলে গেল, কিছু শব্দ অন্ধকার থেকে আলোতে এল, গ্রন্থটি এক নূতন অর্থ পায়। কনটেক্সট বদলাও : শাসক শব্দগুলি বদলাবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে সম্পূর্ণ গ্রন্থটির অর্থ। তাহলে কোন মার্ক্স গ্রহণ করব আমরা ? স্মিথ-রিকার্ডোর মার্ক্স, না হেগেলের মার্ক্স, না আরও অন্য কোনো মার্ক্স ?

মার্ক্সবাদীদের কাছে এর এক সহজ উত্তর আছে : ক্যাপিটালের অর্থ তৈরি করব রাজনৈতিক প্রাকটিসের নিরিখে। ক্যাপিটালের দর্শটি ভিন্ন অর্থেই একজন মার্ক্সবাদী সমদর্শী যদি তা একই রাজনৈতিক প্রাকটিসের ছত্রছায়ায় আসতে পারে। ভিন্ন অর্থ মানেই অ্যানার্কি নয়, বিজ্ঞানের বিনাশও নয়।

এই সহজ সত্য মার্ক্সবাদীরা—এবং আরও অনেকে—ভুলে গিয়েছেন বলেই ডেরিডা নিয়ে এত চে'চামেচি। ডেরিডা কঠিন নয়, নতুনও নয়—তবে একটু পরিশীলিত। ফলে মাথামোটা শাসকেরা শাসনের টেকনোলজি পরিবর্তনে একটু চে'চামেচি করছেন।

ডেরিডা, প্রকৃতপ্রস্তাবে, শেখান কেমন করে যুক্তি করতে হয় : যুক্তির শর্ত এবং সীমা। লেখক নয়, পাঠক কেন এইরকম ভাবছে—এবং অন্যরকম ভাবছে না—পরিষ্কার প্রেজেন্ট করতে হবে : তার চিন্তার প্রক্রিয়া, পটভূমি, প্রেক্ষাপট, কোনো একটা বইতে পড়া কিছু আপাত-বিচ্ছিন্ন চিন্তা যা তার এই বিশেষ লেখাটি বিষয়ে ভাবনাকে প্রভাবিত করছে, তার স্থান, কোন সময়ে সে বাস করে, তার মাধ্যম, এককথায় অনুষঙ্গ। এইভাবেই ইউক্লিড, আঙ্কিক পদার্থবিদ ও অর্থনীতিবিদ যুক্তি করেন, সাহিত্য-সমালোচককেও করতে হবে।

ডেরিডা সাহিত্যের ছাত্রীকে একটু অঙ্ক শেখাচ্ছেন : (বি) ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে শেখ, অন্যরকম ভাবতে শেখ, নানা রকম ভাব, কেন ভাব বল, এবং এইভাবে হয়ত সত্য বেরিয়ে আসবে (বিজ্ঞান বলে) বা আসবে না, সত্য ? সে তো ঈশ্বর—ঈশ্বর নিয়ে ডেরিডা ভাবিত নন। আসল কথা হল যুক্তি : তার জানালাগুলো খুলে দাও, একটু আলো এবং উত্তাপ আসুক স্যাঁতসেতে মনগুলোতে। ডেরিডা মানুষ-মানুষীকে বিজ্ঞানমনস্ক হতে বলছেন।

অতএব ডেরিডার ডিকনস্ট্রাকশন পাঠকের ব্যক্তিগত রিডিং—ফ্রি রিডিং-এর কথা বলে না ; এটি একটি পাঠক-নিরপেক্ষ অবজেকটিভ প্রক্রিয়া : বস্তুজগৎসৃষ্ট বিভিন্ন অনুষঙ্গ থেকে একটি বই পড়া। বস্তুজগৎ-সৃষ্ট : অর্থাৎ পাঠকের মুড-ভিত্তিক নয়—পাঠক নৈরাশ্যবাদী, তাই একটা লেখার কিছু অংশ চোখে পড়ল, বাকিটা নয়, তারপর যা মনে হল তাই লিখে গেল, একে ডিকনস্ট্রাকশন বলে না। ডিকনস্ট্রাকশন

দাবি করবে যে নৈরাশ্যবাদ বিষয়ে লিখিত সংগঠিত আলোচনায়—ডিসকোর্সে—লেখাটি স্থাপিত হোক এবং তার আলোকে সমালোচককে দেখাতে হবে কেন তার ফোকাস—যে অংশগুলোর 'পর সে জোর দিয়েছে—নৈরাশ্যবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাভাবিক, কেমন করে এই ফোকাস লেখার বাকি অংশটিরও অর্থ নির্ধারণ করে এবং তা কীভাবে প্রচলিত আলোচনা থেকে এই আলোচনাটিকে বিশিষ্ট করে—

এইসব। এটি একটি পরিশ্রমসাপেক্ষ যুক্তিনির্ভর প্রক্রিয়া। যুক্তি তার দৃষ্টির গোচরে সবকিছুই আনতে চাইছে, সমস্ত সম্ভাবনা স্পেসিফাই করছে, সীমা নির্ধারণ করছে : তার মতাদর্শগত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করছে। ডেরিডা হলেন একজন পরিশীলিত সমকালীন ফরাসি কান্ট, আধা ফরাসি-আধা আমেরিকান, একজন পরিশীলিত প্রফেসর যিনি মাথামোটা অন্যান্য প্রফেসরদের একটু ভাবতে শেখাচ্ছেন।

না ; তার চেয়েও কিছু বেশি। নানারকমভাবে ভাব, পড়, লেখ, বাঁচ, মালটিন্যাশনাল বলতে পারে, সি আই এ পারে যার জোর আছে, দুর্বল ভারতবর্ষ পারে কি ? বা আরও দুর্বল কমিউনিস্ট পার্টি ? মালটিন্যাশনাল বলে : নানারকমভাবে ভাব, তাহলেই তো তুমি আমার মতো ভাববে কেননা এই সব ভাবনার প্রাকটিস তো একটাই —আমার প্রাকটিস। অন্য কোনো প্রাকটিস হলেই শিশুর ভি ডি ও খেলনা থেকে বেরিয়ে আসে উজ্জ্বল একঝাঁক উড়োজাহাজ, কলিঙ্গের আকাশপথ তখন সম্রাট অশোকের দখলে, যখন মাটির পৃথিবীতে শবেরা মিছিল করে এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বেরিয়ে পড়ে তিব্বতে, চীনে, জাপানে, অসভ্য মানুষগুলো শোনে ভগবান বুদ্ধের শান্ত শান্তিময় বাণী : নানারকমভাবে বাঁচার কথা, দর্শন। আমি সম্রাট অশোকের এম্পায়ারে একটি গুপ্তগহ্বর খুঁজছি।

তিন

একটি কুকুরকে আমরা কুকুর বলি। কেন ?

কুকুরকে কুকুর না বলে ঈশ্বর বললে এবং ঈশ্বরকে কুকুর নামে ডাকলে কুকুরের কুকুরত্ব এবং ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের কিছু যায় আসে না। নামকরণ যা কিছুই হতে পারত, আরবিট্রারি। এটি হল ভাষাবিদ সসুরের প্রথম প্রতিপাদ্য। বস্তুজগৎকে আমরা বিভাজন করি, টুকরো-টুকরো করি, টুকরোগুলিকে নাম দিই, ডাকি : কুকুর, ভালবাসা, ঈশ্বর। প্রতিটি নামেরই একটি অর্থ থাকে। অথবা : প্রতিটি অর্থই একটি নামের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। বস্তুজগতের বিভাজনের সঙ্গে অর্থের জগতেও এক সমান্তরাল বিভাজন ঘটে।

বস্তুজগতের এই বিভাজনও এলোপাথারি, আরবিট্রারি। অর্থাৎ অর্থেরও। এটি হল ভাষাবিদ সসুরের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য। আমরা বলি : নদ, নদী। অন্যভাষায়—ফরাসিতে, স্প্যানিশে—হয়ত নদীর বিভাজন ভিন্নতর (যেমন, ছোট নদী, বড় নদী, সমুদ্রগামী নদী)। পৃথিবীর সর্বত্র, সকলের কাছে, নদী একই অর্থ বহন করে না। অথবা : আমরা

সকলে একই অর্থ প্রকাশ করতে চাই না ; তাই বস্তুজগৎকে ভিন্নভাবে ভাঙি, ভিন্নতর নাম দিই। অতএব বস্তুজগতের নামকরণ এলোমেলো, তার বিভাজন এলোপাথারি। অথচ আমরা কথা বলি, হাসি, ঝগড়া করি, বিনিময় করি। কমিউনিকেট করি। কেমন করে ?

কেননা আমরা তুলনা করতে পারি, একটি টুকরোর তুলনায় অন্য টুকরোটিকে বুঝি। কৃষ্ণ কালো, মেঘ কালো, আঁধার কালো : কালো কাকে বলে ? কালো সাদা নয়, লাল নয়, নীল নয়, হলুদ নয়, সবুজ নয়, এই অসংখ্য শেষহীন 'না'-এর তুলনায়—আয়নায়—আমরা কালোকে দেখি, বুঝি, জানি। প্রতিটি টুকরোই অন্য টুকরোগুলির তুলনায়, বিরোধিতায় অর্থাৎ সংযোগে একটি অর্থ অর্জন করে। টুকরোগুলির অর্থ তাই পরস্পর সংযুক্ত, সংপৃক্ত। এটিকে আমরা সসুরের তৃতীয় প্রতিপাদ্য বলব।

অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত বস্তুজগতের—এবং অতএব তার অর্থের—একটি কাঠামো (বিন্যাস, স্ট্রাকচার) আছে। ভাষাবিদের কাছে চ্যালেঞ্জ : এই আপাত-এলোমেলো বস্তুজগতের এলোপাথারি নামকরণের ভিতর লুকিয়ে থাকা কাঠামোটিকে বের কর তারা কেমন করে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়, ভাব করে, ঝগড়া করে। কেমন করে এই নামকরণ এল, থাকল, চলে গেল—একটি ভাষার ডায়াক্রনিক স্ট্রাকচার—সসুরের ভাবনার প্রধান বিষয় ছিল না। সসুর জানতে চেয়েছিলেন এই সময়ে, মুহূর্তটিতে, ভাষাটির যন্ত্রের কাঠামো, শব্দগুলির সমন্বয়ের নিয়মাবলী—সিনক্রনিক স্ট্রাকচার—কেমন করে তারা পরিবার তৈরি করে, গোষ্ঠী করে, বন্ধু করে।

ফ্রেন্ড শব্দটির অনেক বন্ধু আছে, যেমন—শীপ (ফ্রেন্ডশীপ), লেস (ফ্রেন্ডলেস), লি (ফ্রেন্ডলি), এইভাবে ফ্রেন্ড শব্দটি শীপ, লেস, লি-র সঙ্গে একটি ক্লাব (সিনট্যাগমাটিক রিলেশন) তৈরি করে। আবার 'শীপ' এই টুকরোটি পার্টনারের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারে (পার্টনারশীপ)। এইভাবে শীপ-এর সহযোগে ফ্রেন্ড এবং পার্টনার এই দুটি শব্দের ভিতর এক সম্পর্ক (প্যারাডিগমাটিক রিলেশন) তৈরি হয়। কমকথায় : অক্ষর এবং শব্দগুলির পরস্পরের সঙ্গে সরাসরি এবং মাধ্যমের সাহায্যে যুক্ত হবার কয়েকটি প্যাটার্ন আছে যা আমরা জানি। বেড কথাটি আমি ঠিকই বুঝতে পারব যতক্ষণ নিশ্চয়ভাবে জানি যে আমি রেড/শেড এইসব কথা শুনিনি। কমকথায় : শব্দগুলিকে আমরা চিনি, জানি, বুঝি একে অপরের তুলনায়, সংযোগে যার একটি প্যাটার্ন এবং নিয়ম আছে। শব্দেরা ক্লাব তৈরি করে। ক্লাব : অর্থাৎ সকলের প্রবেশাধিকার নেই, কেউ-কেউ ঢুকতে পারে। এইভাবে শব্দজগতে এক এক্সক্লুশন এবং ইনক্লুশন প্রিন্সিপল্ কাজ করে, যার মাধ্যমে আমরা শব্দদের শনাক্ত করি, তাদের অর্থ বুঝি। শব্দেরা এই ইনক্লুশন এবং এক্সক্লুশন প্রিন্সিপলের মধ্য দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করে, পরিবার ও গোষ্ঠী তৈরি করে, নিজেদের অর্থ তৈরি করে।

অর্থ তৈরি করে : না, সসুর ঠিক এই কথা বলেননি। সসুর বলেছিলেন যে এই পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে শব্দেরা নিজেদের—অর্থাৎ বস্তুজগতের—অর্থ প্রকাশ

করে। ডেরিডা বলবেন : পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থ তৈরি করে, নির্মাণ করে। এইখানেই ডেরিডার ইন্টারভেনশন।

চার

শব্দ এবং শব্দের সহযোগে অর্থ—এবং উদ্বৃত্ত অর্থ—তৈরি হয়, যেমন মানুষ (পুঁজিপতি) এবং মানুষের (শ্রমিকের) সহযোগে তৈরি হয় মূল্য এবং উদ্বৃত্ত মূল্য।
শব্দেরা ইনোসেন্ট নয় ; এখানেও দাস/প্রভু সম্পর্ক বিরাজ করে, ক্রিয়াশীল।
ডেরিডা সসুরের ইনোসেন্স ভেঙে দিলেন। শব্দেরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে : 'কেমনতর সম্পর্ক ? সমতার' ? ডেরিডা জিজ্ঞাসা করবেন। না, সমতার নয়, কিছু-কিছু শব্দ—একটি বাক্যে/পরিচ্ছেদে কিছু-কিছু শব্দ—চোখ টানে, একটা আলাদা জায়গা করে নেয়—উপরের জায়গা, প্রিভিলেজড জায়গা—বাকিরা নিচে পড়ে থাকে, অবহেলিত, দৃষ্টি এবং মনের অগোচরে। কেন এমন হয় ? কেননা আমাদের, পাঠকদের, মনে সর্বদাই কিছু একটা ক্রিয়াশীল, কোনো প্রেক্ষাপট বা কলরব, অথবা অন্য কোনো বই-এর একটি পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়, কিছু শোনা কথা, আমাদের চারপাশ—একটি গল্প/কবিতা/প্রবন্ধের কিছু শব্দ এবং বাক্যকে আমরা আলাদা, বিশেষ মর্যাদা দিয়ে ফেলি। তখন এই শব্দেরা অপর শব্দদের সঙ্গে উপরের জায়গা থেকে সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থাৎ গ্রাস করে। না ; শব্দদের ভেতর কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয় না ; কিছু শব্দ অন্য শব্দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে : প্রভুত্বের, শাসকের। এবং এইভাবে অর্থ তৈরি হয় কেননা অর্থ শব্দদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এই পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়, সামাজিক : নির্মিত। কিছু শব্দ অন্য কিছু শব্দের উপর প্রভুত্ব তৈরি করল, বাকিদের হটিয়ে দিল এবং এইভাবে শব্দদের ভেতর এক অসমান সম্পর্ক স্থাপন হল যার নাম গল্প, কবিতা, প্রবন্ধটির অর্থ।
কিন্তু কেউ, কখনো, কাউকে কি নিচে রাখতে পারে বা তাড়াতে ? যে আছে নিচে, পশ্চাতে, অগোচরে, সে উপরকে টানছে, উপরের 'পর পড়ছে নিচের ছায়া অর্থাৎ আলো, আর সেই আলোছায়ায়—গোধূলি আলোকে—উপরের রূপ বদলে যেতে থাকে, বদলায়, যেন উপর যা, তা নয়, অন্য কিছু, উপরকে আমরা যে অর্থ দিয়েছিলাম তার চেয়ে ভিন্নতর উপর এক উদ্বৃত্ত অর্থ বহন করে চলে। কমকথায় : কিছুই এক্সক্লুড করা যায় না। যাকে বাদ দিয়েছ, সে তার ছায়া ফেলবে অর্থাৎ আছে। যাকে তাড়িয়ে দিয়েছ, সে তার পায়ের চিহ্ন রেখে গিয়েছে : আছে। কাকে বাদ দেবে, তুমি ? রোল কল কর, সকলেই আছে।

অনাম্নী লেখাগুলো উঠে আসছে অন্ধকার থেকে, অবহেলা থেকে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে, নতুন বিবলিওগ্রাফি লেখা শুরু হোক। নতুন যে ঋকব্যকে সিলেক্টেড রাইটিংস বের হল, তাতে যারা বাদ গেল খুঁজে বার কর, তাদের নিয়েই তৈরি কর না তোমার এম. ফিল. ডিসার্টেশন, কে বলেছে

সাদা মানুষের গা-ঘেঁষাঘেষি করা লোকগুলোকে রেফার করেই লিখতে হবে তোমার পেপারগুলো। আমরাই আমাদের এগজামিনার হব।

ইন্টারভিউ বোর্ডের টেবিল উল্টে দাও, কে কার ইন্টারভিউ নেয়? কারা যেন ইন্টারভিউ বোর্ডে হেসে উঠেছিল, 'আহা, মারছ কেন' সিনিয়রতম পুলিশ অফিসারটি বলেন, 'দেখুন স্যার, সেন অ্যাণ্ড দাসের মানির চারটে ফাংশান জানে না' 'কিরে কলেজ স্ট্রিট কেন গিয়েছিলি?' 'ভাইএর জন্য ফুটবল কিনতে স্যার', 'কি বললি?' 'বল্‌স স্যার, বল', হাতদুটি ফুটবলাকৃতি করে সে বলেছিল।

শিরদাঁড়া সোজা কর, সফল মানুষের গায়ের উত্তাপ বা ওকাসা কিছুই তোমার হারিয়ে যাওয়া কাঁচা বয়স ফেরত দেবে না, কেন সফল শব্দগুলির সঙ্গে মিছে গা-ঘেঁষাঘেষি করা।

কালো সাহেবগুলোতো ফরেন মার্কেটে সেমিফিনিশড প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্যই ইউনিভার্সিটির কোর্সের সবটা নিয়ে নিল, ওভাবে কোনো ঢং না করে কোনো মেয়েকে বলতে শুনেছ 'এস শুই', ডেকে আন অসভ্য কিশোর ও চরিত্র, সিটি দাও জোর তুমি বুঝি কলোনির ছেলে। তারপর আস্তাকুঁড় থেকে শব্দ কুড়িয়ে আন, জড়ো কর, শব্দ বোমা তৈরি হল, ছোড়, শব্দবোমা ছোড়। দাউ-দাউ করে জ্বলে রাজধানীর ইউনিভার্সিটি।

পাঁচ

ডেরিডা পরিচিত ফিলসফি অফ প্রেজেন্স ভেঙে দিলেন। যে অ্যাবসেন্ট, সে-ও আছে, প্রেজেন্ট। তা না হলে আমরা কেমন করে বুঝব গতি বা ফুটবল খেলা। মারাদোনা ফুটবল পায়ে ছুটছে অথচ মাল্লাদোনা সবসময়েই আছে কোনো এক স্থানে। মারাদোনা যদি সবসময়েই কোনো না কোনো স্থানে থাকে তাহলে সে কেমন করে ছোটে?

মারাদোনার ছোটাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি যদি তার অবস্থানটি—প্রেজেন্স—পূর্বতন স্থানগুলি, যাকে সে ফেলে এসেছে, তার চিহ্ন বহন করে। প্রেজেন্সের অভ্যন্তরে অ্যাবসেন্স আছে বলেই আমরা বুঝতে পারি ধাবমান রেলগাড়ি, শিল্পকলা এবং ভালবাসা। জীবন পরীক্ষার খাতায় উত্তরের চেয়ে কিছুটা বেশি জটিল এবং রহস্যময়ী। 'পরিষ্কার লেখ, দু-নম্বর বেশি পাবে' এইভাবে ভাবতে-ভাবতে ইউনিভার্সিটির ভাল ছাত্রটি প্রফেসর হন, সব কিছুই পরিষ্কার—অর্থাৎ প্রেজেন্ট—দেখতে চান এবং এইভাবে তিনি নগ্ন হন প্রতিদিন অর্থাৎ প্রতিরাত। অথচ জীবন, যে একজন নারী, কিছুটা তো আবরণ চায়, সে কি তার লজ্জা না লীলা? প্রফেসর নারীটির পোশাক খুলে নেন; তিনি শুধু জানেন না পোশাকের অভ্যন্তরেও থাকে আর এক পোশাক—এতো দ্রৌপদীর বস্ত্র, দুঃশাসন কি পারবে তা হরণ করতে?

আসলে কোনো কিছুই পরিষ্কার নয়, একটা মুখের মধ্যে মিলেমিশে আছে অনেকগুলো মুখ—মুখ? সে তো মেটাফর। (কেন সেই মুখ খুঁজে ফের তুমি, সব মুখেই তো আছে তার মুখ, আছে না?) একটি মুখেই তো অন্য মুখগুলো চিহ্ন রেখে গেছে—ট্রেসেস—এই মুখ অন্য মুখ থেকে আলাদা—ডিফারেন্ট—কেননা সে শুধু ডেফার করে অন্য মুখগুলোকে, তারাও আছে, আবির্ভূতা হবার জন্য, একটা মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে অন্যমুখগুলো। একমুখ, অন্যমুখ, যে কোনো মুখ।

ডিফার্যান্স : যা ডিফার এবং ডেফার করে যুগপৎভাবে, একইসঙ্গে ডিফার করে এবং দি অ্যাক্ট অফ ডিফারিং, সবসময়েই এই ডিফারেন্সের খেলা চলে, দি প্লে অফ ডিফারেন্সেস। এই পৃথকীকরণের শেষহীন খেলা আছে বলেই তো পার্থক্যীকরণ 'এই বইটা পড়লাম, বেশ লাগল'। আবার এই পার্থক্য তো একটা প্রতীক্ষা মাত্র, এই বইটিতো আর একটি বই হবার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে, একটি বই-এর ভিতর লুকিয়ে থাকা অন্য বইগুলো, সবসময়েই একটি বই থেকে অন্য বই লেখা হয়, প্রথম বই বলে কিছু নেই—আদি নেই—অতএব অন্তও নেই। একে তোমরা যে কোনো নামেই ডাকতে পার : ডিফার্যান্স, স্পেসিং, এস্পেসমেন্ট, ঈশ্বর। কী, কঠিন লাগছে, মাথাটা ঘোরে? আসলে এটা হল লেখকের খেলা, ম্যাজিক। লেখকের স্ত্রী সেজেগুজে সুপারমার্কেটে যান, লেখক একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে অর্থাৎ কঠিন করে তাঁর কথাগুলো রাখেন। যদি বল, বাদ দেব—দিলাম—এই অনুচ্ছেদ।

ছয়

একটি মুখেরই ভিতর আছে অন্যমুখগুলো : অর্থাৎ মুখটি উদ্বৃত্ত অর্থ বহন করে—সে যা তার চেয়েও বেশি কিছু। মুখ একটি রিজার্ভার যা ওভারফ্লো করে। আবার, এই স্থানে, মুহূর্তটিতে, তো আমি একটিই মুখ দেখি। অতএব, এই মুখ একটিই মুখ, অন্য মুখ নয়। তাই অভাববোধ—ল্যাক—থাকে : আমি অসম্পূর্ণ, আমি যা তার চেয়ে ছোট—বেঁটে—হয়ে আছি, কোথাও অভাবের ছায়া থেকে যায়। অথচ এই অভাব ব্যক্তির—দর্শকের, শ্রোতার, পাঠকের—বস্তুর নয়। ছোট ঢিপির উপর দাঁড়িয়ে, ধুলোঝড়ের ভিতর থেকে, কলরব অতিক্রম করে, ব্যক্তি বস্তুকে বহুরূপে দেখতে পাচ্ছে না। অথচ আর একটু চেষ্টা করলেই তো সে বেরিয়ে আসতে পারত তার ব্যক্তিগত কুয়ো থেকে, তখন সে দেখলেও দেখতে পারত যে আকাশ আরও বড়, দিগ্‌বিদিক্‌, বল্গাহীন, আর তার মনে পড়ত, বুড়ি-ঠাকুমার কাছে শোনা সেই সীমার ভিতর অসীমের কথা যখন কৃষ্ণ অর্জুনকে দেখিয়েছিল তার বিশ্বরূপ : বেদের ভিতর আমি সামবেদ, ধেনুর ভিতর কামধেনু, আমি অগ্নি, আমি বায়ু, আমি বরুণ।

অভাব ব্যক্তির, বস্তুজগতের নয়। আবার ব্যক্তিও বস্তু জগতের এক অংশ ; তাই অভাব ব্যক্তির নয়, তার অজ্ঞতার। ব্যক্তি জানে না যে সে অসীম : আদিহীন, অন্তহীন। খণ্ড-খণ্ড টুকরোগুলো জড়ো করে সে তৈরি করতে পারত—করে—এক টোটালিটি যা সম্পূর্ণ। এমনি করেই তো তৈরি হয়েছিল চীনের প্রাচীর, কাফকা বলেছিলেন : খণ্ড-খণ্ড বিচ্ছিন্ন দেওয়াল গড়ে তোল, ফাঁকগুলোতে জড়ো কর বারুদ আর উপকথা, উৎসব কর—চীনের প্রাচীর তৈরি হয়ে গেছে। (কেমন করে জানলে, দেখেছ কি? কে বলল, সম্রাট? চেন কি তাকে? অথবা শত্রুদের যাদের জন্য এই চীনের প্রাচীর?) আমাদের অভাব নাই, কেননা আমাদের মিথ আছে, উপকথা আছে। এই অভাবহীনতার কোনো সমাজবিজ্ঞান হয় না, যুক্তি হয় না, যুক্তির ব্যাখ্যায় সব সময়েই অভাব থাকে

কেননা যুক্তির ভিতরে—যুক্তি ধারণাটিতেই—অভাব আছে। সর্ষের ভিতরেই ভূত। প্রশ্ন : আমরা কি কোনো সম্পূর্ণতা তৈরি করতে পারি—চীনের প্রাচীর—যেখানে ফাঁক থাকলেও উৎসব থাকে ?

অনেক অভাব তৈরি করল ওরা : সিভিল সোসাইটি এল না, বুর্জোয়া প্রণয় ও বুর্জোয়া পরকীয়া হল না, বিবাহের আগে সঙ্গম না সঙ্গমের আগে বিবাহ (বিবাহ কি হবে রাজাসাক্ষী করে না আগুন ?) এইসব জিজ্ঞাসা ও অভাব নিয়ে উত্তেজিত বিতর্কের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে যায় দুপুর, বিকেল। ইনকমপ্লিট মডার্নাইজেসন এবং তজ্জনিত অভাববোধ, ল্যাক : এটাই ছিল ওদের একমাত্র আলোচনার বিষয়। ক্রমশ অভাব রোমান্টিসাইজড হয়, একটি ফেটিশ তৈরি করে : আমার সংসার, ধর্মের ষাঁড়, বিদেশ-ভ্রমণ এবং একটি অভাববোধ আছে—আমি তোমার চেয়ে এগিয়ে। এইভাবে অভাব একটি হেগেলীয় ইউনিভার্সাল—নেগেটিভ ইউনিভার্সাল—তৈরি করে, অভাবের সন্তান আমরা। তখন সাদামানুষেরা এবং কালোমানুষেরা গোলটেবিলে বসে, অভাব নিয়ে আলোচনা করে —তোমাদের দেশে অভাব কেমন ? আমাদের দেশে···। অভাব যদি ইউনিভার্সাল হয়, ইউনিভার্সালি ভাগ করে নেওয়া যায় (শেয়ারড্ হয়), কমিউনিকেট করা যায়, (পেপার লেখা যায়, কনফারেন্স করা যায়) তখন তা কেমন অভাব, অভাব কি তখন একটি ক্লিশে নয় ? ডেরিডা বলবেন এই পৃথিবীতে, চেতনার জগতে, কোনো অভাব নেই কেননা আমরা সব সময়েই সাপ্লিমেন্ট করতে পারি, আর যখন আমি সাপ্লিমেন্টই করতে পারি তখন তো কখনই অভাব ছিল না কেননা সাপ্লিমেন্ট করার সম্ভাবনা তো বস্তুর মধ্যেই নিহিত ছিল। (প্রশ্ন : কে সাপ্লিমেন্ট করে ? প্রভু না ভৃত্য ? কার হেগেমনি ?)

"আমি তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না, তোমার মুখ হারিয়ে যাচ্ছে, কী বিশ্রী মাংসল হয়েছ তুমি, আর তখন আমার মনে পড়ল ছেলেবেলার মাস্টারবেশনের দিনগুলোর কথা, প্রতিরাত আমি আমার থাইমার সঙ্গে মিলিত হতাম জাগরণে, স্বপ্নে, আমি আমার থাইমাকে মনে করে তোমার মুখের দিকে, তাকালাম, তখন, কী আশ্চর্য, তোমার মুখ কেমন বদলে গেল, মাংসল তুমি তখন এক হস্তিনী যেন, তুমি নও, থাই-মা নয়, অন্য এক নারী যেন, প্লাম্প, তার ভারীশরীরের ভাঁজে, ফাঁকে লুকিয়ে আছে এক আহ্বান, আমি তোমার কাছে গেলাম, তুমি বললে কী হল, আজ ?" —এটা ছিল কারো এক কনফেসন, রুসোর কি ?

প্রতিদিনের—এবং রাতের—সেক্সে অভাব থাকে কেননা একটি মুখকে মূঢ় মানব একটিই মুখ ভেবেছিল। একটি মুখকে যারা বহুমুখ ভাবতে পারে, তারা শিল্পী।

মাস্টারবেশন সাপ্লিমেন্টারি : বাস্তবের সেক্সকে সাপ্লিমেন্ট করে। বাস্তবের সেক্সে অভাব থাকে না যখন মাস্টারবেশন তাকে সাপ্লিমেন্ট করতে পারে। তখন মাস্টারবেশন আর মাস্টারবেশন থাকে না বা বাস্তবের সেক্স বাস্তবিক, সব মিলে সেক্স তখন এক অন্য কিছু : সম্পূর্ণ। তখন বেডরুমের মানুষ এবং মানুষীটি অভিনেতা এবং অভিনেত্রী যেন বা, 'এসো আমরা আজ এই রোলে প্লে করি।' সেই রোলগুলি লিপিবদ্ধ করা যায়—হয়—

বাৎসায়ন করেছিলেন। মাস্টারবেশন সম্পূর্ণ, কেননা মাস্টারবেশনের ভিতর দিয়েই প্রতিদিনের সেক্স তার মাত্রাগুলি অর্জন করে।

আমি পরাশর, তীব্র সূর্যকে ঢেকে দিলাম অমোঘ এক কুজ্ঝটিকায়, আমার স্পর্শে মেছুনী তখন সত্যবতী, রাজরানী : মহাভারতের মা। পারবে শান্তনু, রাজচক্রবর্তী, আমার মতো ঋণী হতে, কিংবা জন্ম দিতে এক প্রবাদশিশুর ?
আমি এক নারী নির্মাণ করি, যার আত্মা নেই, শুধু শরীর আছে—উজ্জয়িনীর নারীরা তাঁর অনুকরণে ভ্রূবিলাস করে নগরীর রাজপথ দিয়ে হাঁটে শরীরময়ী "সেই নারী", এলিটপাড়ার হাভাতে স্বামীগুলো হাঁ করে দেখে।

সাত

সব কিছুতেই কি অর্থ আছে, খুঁজতেই হবে। সস্যুর বলেছিলেন যে শব্দজগতের আন্তঃসম্পর্কই অর্থ প্রকাশ করে। ডেরিডা সংশোধন করলেন : অর্থ তৈরি করে। কিন্তু অর্থ কি থাকতেই হবে ? মোনালিসার হাসির কি কোনো মানে আছে ?
হেগেল বলেছিলেন যে এসেন্স (সারবস্তু) অ্যাপিয়ারেন্স রূপে প্রকাশ পায়। ডেরিডা বললেন : অ্যাপিয়ারেন্স এসেন্স নির্মাণ করে। এসেন্স কি তৈরি করতেই হবে ? শুধু প্লে অফ অ্যাপিয়ারেন্সেস, হয় না ? যেখানে পাওয়ার নেই রিসন নেই ফুকো নেই ডেরিডা নেই, আছে শুধু তুমি আর আমি : প্রকৃতি, ভালবাসা অর্থাৎ বিস্মরণ। ডেরিডা রুসোর প্রকৃতি—স্টেট অফ নেচারের মানে বোঝেননি। প্রকৃতি হল সমাজেরই অভ্যন্তরে এক গুপ্তগহ্বর যেখানে সমাজের আলো—gaze—প্রবেশ করে না। অর্থাৎ বিস্মরণ আছে। বিস্মরণ কী ? প্রভু অর্থ তৈরি করে। তাই অর্থের বিস্মরণ—ডেস্ট্রাকশন—মানে প্রভুকে ভুলে যাওয়া, প্রভুর বিস্মরণ। গুপ্তগহ্বর তৈরি কর—আন্ডারগ্রাউন্ড, বেসএরিয়া—যা প্রভুর নাগালের বাইরে।
বিস্মরণ স্বাধীনতার আর এক নাম। যেহেতু সাম্য এক সোনার পাথরবাটি, এবং প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কই একমাত্র বাস্তব, আমি সাম্য, স্বাধীনতা, ঈশ্বর বা প্রভুত্ব খুঁজি না, ভৃত্য-রূপে নিজেকে চিনি, বস্তুত প্রভুকেও। কেননা প্রভুরও সকল স্বাধীনতা নেই, যেমন প্রভুমাত্রেরই স্পন্ডিলাইটিস থাকে, ফলত সে মাথা নোয়াতে পারে না এবং এই কারণে প্রেম, কবিতা এবং ড্রাগ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রভুর কাজ জয় করা, এই কারণে সে অনেক সময় আহত হয়, যেমন হার্ট অ্যাটাকে এবং নিন্দুকের ছোড়া ঢিলে। বাঁচার জন্য তার কিছু পারিষদ চাই। প্রভু নির্বান্ধব। আমি প্রভু হতে চাই না।
নিজেকে ভৃত্যরূপে চেনাই হল সবচেয়ে বড় সচেতনতা। আর সকলেও ভৃত্য, শুধু জানে না যে তারা ভৃত্য ; ফলত তারা প্রভুর কণ্ঠস্বরে কথা বলে। কেউ-কেউ সোস্যাল ক্লাইমবার যারা, প্রভুর এজেন্ট হয়। বাকিরা নিষ্পাপ, কিছুটা নির্বোধ, যীশুর সন্তান। (কলার তুলে যারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের কলার চেপে ধর, দেখবে কলারের তলায় শিকলের দাগ।)

আমি প্রভু হতে চাই না কেননা আমার মনে হয় যে প্রভুর চেয়ে ভৃত্যই বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে। যেমন, আগেই বলা হয়েছে, প্রভু কবিতা বোঝে না যদিও সে কবিতা লেখে এবং বন্ধু-পত্নীদের কবিতা শোনায়। অবশ্য ভৃত্য হবার কয়েকটি অসুবিধা আছে। যেমন সময়মতো প্রোটিন, ভিটামিন এবং কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায় না এবং সবসময়েই মাস্তানদের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে। আমি যেহেতু এইসকল অসুবিধার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে শিখেছি, ভৃত্য হওয়াই পছন্দ করি।
আমি ভৃত্য একটি সীমা পর্যন্ত, আপেক্ষিক। প্রভুকে আমি তার সীমা বেঁধে দিই— প্রভু যেন আমার শেকলে বাঁধা কুকুরটি। আমি কুকুরটিকে খাবার দেব, পরিবর্তে কুকুরটি আমার বাড়ি পাহারা দেবে, যেমন সূর্য ও স্যাটেলাইটগুলি পৃথিবী ও নেশনস্টেটগুলিকে রক্ষা করে তাদের নিরীক্ষণের মাধ্যমে। আমি প্রভুকে রাত্রির আকাশে তীব্র সার্চলাইট ঘোরাতে বলেছি যাতে আমি ধেয়ে আসা ঝড় এবং শত্রুদের আক্রমণের আগাম খবর পাই। শুধু রাত্রির আকাশে এক আশ্চর্য সিগনাল ঘোরাফেরা গুহা-মানবের কাছে, গুহা থেকে গুহান্তরে : সবকিছু ঠিক আছে তো? কখন জড়ো হতে হবে? কোথায়? কীভাবে? প্রভু এবং তার নির্বোধ চাকরেরা এর অর্থ বোঝেনি।
বাদবাকি বিস্মরণ—বিস্মরণ স্বাধীনতার আর এক নাম। কেন আমি সবসময় প্রভুর সঙ্গে লড়াই করব, অর্থাৎ প্রভুর কথা—প্রভু হবার কথা—ভাবব? কেন আমি দেখব নিজেকে প্রভুর চোখে, আয়নায়? চিরস্থায়ী যুদ্ধে কোনো মহত্ত্ব নাই : তারাই প্রভুর সবচেয়ে বড় সাধক যারা প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল চিরকাল।

কে রাজা কেই বা উজির? ঝুপড়ির ছেলেরা লিখতে শুরু করল, কাউন্টার হেগিমনি তৈরি হয়, গল্পের টিয়াপাখির শরীরে হাত পড়ে আর ভদ্দরলোকেরা তাদের জন্তুর মুখগুলো দেখাল—ওরা নাকি লেখাপড়া জানে, সোফিসটিকেটেড। জন্তুগুলোর সঙ্গে লড়াই করেই দিনরাত কাটাব কেন, এসো দিনশেষে আগুন জ্বালিয়ে একটুখানি উৎসব করি, নাচি, তারপর জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে পড়ি। গুহার কোটরে-কোটরে থাকবে হাতের ছাপ, তোমার, আমার : আমাদের লেখা। ঠোঁটগুলো সবসময়েই কামড়ে বসে থাকে কেন গো তোমার, যেন যুদ্ধজয় করতে চলেছ, ঠোঁট ভালবাসার জন্য, যুদ্ধজয়ের জন্য নয়। রোজ সকালে উঠে আমি মনে-মনে বলি : আজ নতুন করে প্রেমে পড়ব। মা বলে : পোড়ামুখী দু চক্ষের বিষ ফের তুই প্রেমে পড়েছিস। আমি বলি 'মা, তুমিও প্রেমে পড়, আর কতদিন স্বামীর বন্ধুদের আপ্যায়ন করে যাবে তুমি। এসো, বোষ্টুমী হই' জ্ঞানদাস চণ্ডীদাস এবং জীবনানন্দ দাশের ব্যবধানে আর কোন কোন কবিকেই আমরা চিনি না ভোল ভোল বেঙ্গল রেঁনেসাস ভোল নৈয়ায়িকদের ভোল হৃদি ভেসে যায় যমুনার জলে।

॥ দ্বিতীয় ভাগ ॥

তুমি তো জান না কিছু, না জানিলে,
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে।

কপট ;
মূর্খ, সস্তায় বাজিমাত করছে ;

অগভীর,
ফ্রাসট্রেটেড ;
একটা জোকার, কিছু জানে না, হামবাগ ;
বদমাস।

মুখ আছে, বলে যাও। তবু তুমি আমাকে এড়াতে পারবে না। আমি তোমার ছায়া, তোমাকে অনুসরণ করি, গুপ্তচর। আমি তোমার মাথার চারিপাশে। তোমার কানের চারিপাশে। তোমার বুকের চারিপাশে, ভিতরে। তুমি আমার গান অস্বীকার করতে চাইছ, পারছ না, গানগুলি তোমাকে অনুসরণ করে, এনসার্কল করে, আক্রমণ করে, তোমার ভিতরে প্রবেশ করে, তুমি অন্ধকারে দেখ যাকে তুমি খুন করেছ সে : ভূত।

আমি নগরীর ছেলেদের বাঁশি বাজিয়ে নিয়ে যাব সর্বনাশের দোরগোড়ায় আর ভদ্দর-লোকদের মেয়েদের শেখাব কেমন করে ঝুপড়ির ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করতে হয়। খাবার টেবিলে বসে তোমার মেয়ে যখন তার ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে গল্প করবে সেই অদ্ভুত মানুষটার কথা আর তুমি শুনবে যে তার মুখেও আছে কাটা দাগ তখন তুমি কী হল ভয় পেলে ?

আর সবাই যখন পংক্তিটির শেষ দুটি শব্দকে "লক্ষ্য করে" পড়ে একজন মামুলি প্রেমিকের দেবীপুজো দেখছেন, খালাসিটোলার এক লেখক শিখিয়েছিলেন যে শিরদাঁড়া সোজা করে পড়লে জীবনানন্দ দাশের কবিতার মানে কেমনভাবে বদলে যায়, ডিকনস্ট্রাকটেড হয়। শ্রী সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ই ভারতবর্ষে ডিকনস্ট্রাকশনের প্রথম প্রবক্তা, উদ্ভাবক। □